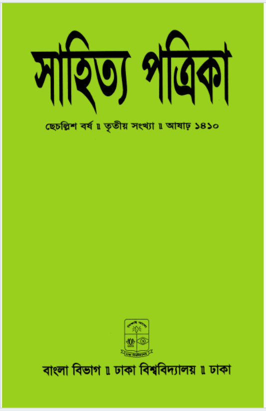

Vol. 46 | No. 3 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মন্বন্তরের চালচিত্র

Volume	46
Issue	3
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ সিরাজুল ইসলাম
Published online	June 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i3.333
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i3.333
Pages	১১৪-১২৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মন্বন্তরের চালচিত্র

Check for updates

মোঃ সিরাজুল ইসলাম *

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮—১৯৭০) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আর্থসামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও সময়সচেতন গল্পকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের প্রেক্ষাপটে উপনিবেশিত রাজনীতিতে উত্তাল চল্লিশের প্রস্তুতিপর্বে তাঁর আবির্ভাব। সময়ের অন্তর্টানে তিনিও অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং কারাবরণ করেন। কারাগারে মার্কসবাদে দীক্ষা ও বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় হলেও ১৯৪২ সালে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি নিজেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে গুটিয়ে নেন।[১] তবু কাঠামোগত সম্পৃক্তিই রাজনীতির শেষ কথা নয় — এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানব-প্রীতিকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়েছে আবেগের তীব্রতায় মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর-ঘনিষ্ঠ সহানুভূতি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সময়গ্রন্থির বিভ্রান্তিহীন দ্রষ্টা এবং বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই তাঁর মুক্ত জীবনের বাণী উচ্চারিত।[২] মানবিক অপচয়ের প্রেক্ষাপটে তিনি সামাজিক ক্ষোভকে তীব্র রাজনৈতিক সচেতনতায় আত্মস্থ ক'রেছেন এবং মানুষের প্রতিই তাঁর গভীরতর আকর্ষণ। 'ধনবণ্টন ব্যবস্থার বৈষম্যে মানুষের শ্রেণীগত বৈপরীত্য ও অবস্থান্তরের প্রকৃতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'[৩] ভারতবর্ষে জাপানি আক্রমণ (১৯৪১), আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যা (১৯৪২) দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), চোরাকারবার ও মজুতদারি, যুদ্ধপ্রস্তুতির ক্ষেত্র হিসেবে কলকাতা ও বাংলাকে ব্যবহার (১৯৪১—১৯৪৫), দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তুস্রোত (১৯৪৭—১৯৫০) প্রভৃতি আর্থসামাজিক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। মূলত উপযুক্ত অপচয়ের প্রেক্ষাপট নিয়েই গল্পকার জানিয়েছেন : "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কঙ্কালের

★ সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

এক অপূর্ব শোভাযাত্রা। সেদিনের সেই অসহ্য আত্মগ্লানি আর গর্জনের মধ্যে আমিও গর্জন করে উঠেছি, 'যুগান্তরে' লিখেছি 'নক্র-চরিত', 'আনন্দ বাজারে' লিখেছি 'দুঃশাসন', 'দেশে' লিখেছি 'পুষ্করা'।"[৪] মূলত এই তিনটি গল্পের নিবিড় পাঠের মাধ্যমে গল্পকারের মন্বন্তরকেন্দ্রিক আত্মগ্লানি, যন্ত্রণা ও গর্জনের স্বরূপ চিহ্নিত করার বর্তমান প্রচেষ্টা।

১.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উপনিবেশিত স্থবির উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা এবং শাসন কৌশলের চক্রান্তে সৃষ্ট হয় কৃত্রিম খাদ্যসংকট। মুনাফালোভী মজুতদার ও কালোবাজারির দৌরাত্ম্যে যে দুর্ভিক্ষ ও মানবীয় অপচয় তারই সময়সচেতন শিল্পরূপ 'নক্র-চরিত'[৫] গল্পটি। গল্পের আকস্মিক ও মাধ্যমিক সূচনায় (middle of the action) পরিচয় ঘটে বিনিদ্র নিশিকান্ত কর্মকারের সঙ্গে। নিশিকান্ত কর্মকার যেন অন্ধকারে মোহগ্রস্ত কর্মযোগের নামাঙ্কিত রূপক। অন্ধকার, তেল পুড়বার ভয়ে মিটমিট আলো আর হিসাবের খাতা নিয়ে নিশিকান্ত 'শকুনের' প্রতীকতায় তাৎপর্যময়। তার জমা-খরচের অন্ধকার জগতে ততোধিক অন্ধকার মনোজগত 'সরীসৃপ' সংগতি পায়। কেবল বর্ণনা নয়, ইঙ্গিতময়তায় জানা যায়, অন্ধকার, শকুন, সরীসৃপ ও সিন্দুকের বাণিজ্যিক যোগসূত্র; আর 'সিন্দুকটার জঠর' পরিপূর্ণ কাঁচা সোনা, অলঙ্কার ও নগদ টাকায়। 'জঠর' কেবল জ্বালাকে নির্দিষ্ট করে না, তীব্র অবৈধ ক্ষুধাও তার অনুষঙ্গ। নিশিকান্তের অকাল-বাঁকা পিঠের সংযোগ নিম্নমুখে খাতার সঙ্গে এবং তা প্রত্যক্ষ; কিন্তু এতে 'হাতুড়ির সংস্রব' নিশ্চিতভাবে 'কর্মকার' উপাধিধৃত ভারতীয় সনাতন অর্থনৈতিক বর্গে। এর মাধ্যমে হাতুড়ি ও কলমের প্রতীকী বিদ্রূপাভাস স্পষ্ট। ভারতীয় কর্মকার—সমাজ সংগঠনের অন্যতম উপাদান — অর্থনীতিক বিকাশের সূত্রে 'খেরো-পাতায়' মসিজীবী। কিন্তু এতে 'বিলেতি লোহার' ইঙ্গিতই বিপত্তির উৎস নির্দেশক। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-ভাঙনের আবর্তে একদা ইতিবাচক সামাজিক কারিগর নিশিকান্ত কর্মকার এখন সুযোগ সন্ধানী—অবৈধ বিত্তের উল্লাসমগ্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন সংগ্রাহক।

নিশিকান্ত পোশাকী (formal) ডাকাতের আশ্রয়দাতা মাত্র নয়, ডাকাতিকৃত স্বর্ণালঙ্কারেরও স্বল্পমূল্যের ক্রেতা। ফলে নিশিকান্ত সামাজিক নক্র-চক্রের অন্যতম পুরোহিত। ডাকাতদলের স্বর্ণালঙ্কার, হত্যা-গুম ও অমানবিকতা নিশিকান্তের সময়-সিন্দুকে আবদ্ধ হয়ে আছে। মদন-যোগীর ক্ষুধার সঙ্গে ডাকাতির যে সম্পর্ক তা আর্থসামাজিক বৈষম্য ও নির্যাতনের তুল্যমূল্যে বিচার্য হতে পারে। নিশিকান্তের সিন্দুকের ক্ষুধার সঙ্গে নিশ্চিতভাবে এর পার্থক্য বিদ্যমান। মদন সময় সংক্ষেপের

জন্য কানসহ দুল নিয়ে আসে, তবু অপর ডাকাত যোগী এই কর্মকে অমানবিক মনে করে। ডাকাতের সংঘেও 'জীব সৃষ্টি করেছেন অথচ তাদের আহার যোগাবার বেলায় এত কার্পণ্য, কেন?' — মন্তব্য শ্লেষবিস্তার করে যায়। কিন্তু নিশিকান্ত নির্ভেজাল সুযোগসন্ধানী ও প্রতারক :

– বারো ভরি রূপো।

– আর সোনা? – মদনের কণ্ঠস্বর উৎকণ্ঠিত শোনালো।

– সোনা? সোনা কোথায়? কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তিন ভরিও হবে না বোধ হয়।

– বল কি! মদন চমকে উঠল : এই হার, চুড়ি –

– সব গিল্টি।

– গিল্টি! – মদন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে নিশি কর্মকারের মুখের দিকে।...

নিশি কর্মকার ভ্রূকুঞ্চিত করলে।

> – বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তাহলে তোমাদের মাল তোমরাই নিয়ে যাও, বদনামের মধ্যে আমি নেই। [*গল্পসমগ্র*, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ২০৯]

ডাকাতি নিশ্চিতভাবে আর্থসামাজিক বৈষম্য-পীড়নের নেতিবাচক সত্য এবং নিশিকান্ত ও ইব্রাহিম দারোগার সহায়তায় তা কাঠামোগত রূপ পায়। সমগ্র আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কেন্দ্রে যে দুর্বৃত্তায়ন তার যোগসূত্র রচিত হয় মদন ডাকাত–নিশিকান্ত মহাজন–ইব্রাহিম দারোগার মাধ্যমে। কেননা মদন ডাকাতের ক্ষোভ থাকলেও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতা এবং নিশিকান্তের রাষ্ট্রক্ষমতা— মজুতদারি, ব্যবসায়, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতিত্ব ও পুলিশকে মন্ত্রমুগ্ধ করার শক্তি আর্থসামাজিক প্রাধান্যকে নিশ্চিত করেছে। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের সুবিধালগ্ন নিশিকান্ত ব্যবসায়ের অন্তরালে সৃষ্টি করছে অনৈতিক চক্র, যেখানে 'অধর্মের রোজগার গোমাংস আর গোরক্ত' অন্তশ্লেষ বিস্তার করে এবং মদনও নিশিকান্তকে 'সরকারের পেয়ারের লোক' বলে ছাড় দিতে বাধ্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্টভাবেই অনুভব করেছেন অবৈধ কর্মকাণ্ড ও বিত্তকে আবৃত করার জন্য প্রয়োজন ধর্মের ব্যবহার এবং অনৈতিকতার সূত্রেই আবির্ভূত হয় বিরংসার ক্লেদাক্ত রূপ। 'শিয়ালের জয়ধ্বনি চিহ্নিত' ইঙ্গিতময় রাত্রির শেষ প্রহরে 'বৈষ্ণব মানুষ' নিশিকান্ত 'মালা জপ শেষ করে জুড়ে দেয় বেসুরো গলায় কীর্তন।' দিন-রাত্রির বিষয়-কর্মের ক্লেদকে জপমালা ও কীর্তনের শক্তিতে মুছে দেওয়ার প্রয়াস যেমন আত্মসচেতন অনৈতিকতা, তেমনি বৈষ্ণব ধর্মের ভণ্ডামিতে হাড়ির মেয়ে কষ্টবালা পরিণত হয় বিশাখায়, 'নিশির বৃন্দাবনলীলার লীলাসঙ্গিনী।'

নিশিকান্ত রাষ্ট্রকে আয়ত্ত করেছে, অনৈতিকতাকে দিয়েছে ধর্মের আবরণ এবং এর মাধ্যমে সামাজিক শোষণ ক্ষমতা বিবর্ধিত হয়েছে। তবু নিশিকান্তের অনিঃশেষ লোভ ও বার্ধক্যের বাস্তবতা লাস্যময়ী বিশাখার উপস্থিতিতে সৃষ্টি করে কূটাভাস :

> তড়িৎচমকের মত নিশির মনে হল : তারই বয়স বেড়েছে শুধু, তারই জীবনগ্রন্থির সমস্ত রস গেছে শুকিয়ে; কিন্তু যৌবনের ভরা লাবণ্যে বিশাখা এখনো টলমল করছে শতদল পদ্মের মতো। এত মধু—এত প্রচুর মাধুরী, আজ আর তার এ আস্বাদন করবার অধিকার নেই, সামর্থ্যও নেই। সিন্দুকের জমানো সোনার তালগুলো রূপের এই প্রতিমাকে সে পাহারা দিয়ে চলেছে, রাজভাণ্ডারে সে প্রহরী মাত্র। [*গল্পসমগ্র*, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ২১১]

জীবনের লোভ, ভোগ-উপভোগ ও সামর্থ্যের বাস্তবতা নিয়ে উদ্ধৃতিটিতে নিশিকান্তের জন্য শ্লেষ বিন্যস্ত হয়েছে। দায়িত্বহীন অর্থ-বিত্ত সংগ্রহ জীবনকেন্দ্রে সৃষ্টি করে শূন্যতা এবং সেই বিত্ত-সম্পদ আয়ত্তে রাখাও অসম্ভব। এজন্যই নিশিকান্তের লীলা-সঙ্গিনী বিশাখার 'সর্বাঙ্গে লাবণ্যের ঢেউ' ও 'গৌরমুখে রঙিন আভা' দেখা দেয় ইব্রাহিম দারোগার উপস্থিতিতে। এ নিয়ে যদিও নিশিকান্তের ঈর্ষা, তবু দারোগা 'মহামান্য অতিথি' এবং বিশাখার 'মূল্যবান প্রেমিক'। সংগ্রহ ও ব্যবহারের বিরোধমূলক ঐক্যের আর্থসামাজিক বাস্তবতাটি যেমন বিশাখার ক্ষেত্রে, তেমনি উপনিবেশিত ভারতবর্ষের অন্তর্সত্য।

ইব্রাহিম দারোগা রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম প্রতিনিধি, যারা 'স্বদেশীওলারা' নয়, নিশিকান্তকেই 'বিবেচক আর বুদ্ধিমান লোক' মনে করে এবং এর দ্বারাই নির্ধারিত হয় উপনিবেশের জনপ্রশাসনের স্বরূপ। বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যখন সর্বত্র চালের অভাব ও দুর্ভিক্ষ; দারোগাও জানে নিশিকান্ত 'একটি সাক্ষাৎ ঘোড়েল-ভুঁড়ো কুমির' এবং নিশিকান্তও 'হরে কৃষ্ণের' আশ্রয় সন্ধানী। আশ্রয় অবশ্য রাষ্ট্রই দেয়, দারোগা জানায় : 'বিস্‌মিল্লা বলে আমার দরগাতেই মুরগী জবাই করে দিও, আমি বহাল তবিয়তে থাকলে তোমাকে ছোঁয় কে!' যুদ্ধ ও মন্বন্তর ভারতবর্ষে সমসূত্রে গ্রথিত ঔপনিবেশিক সত্য এবং নিশিকান্তের মতো মজুতদারেরা বারো টাকা মণ দরে কেনা চাল চল্লিশ টাকায় বিক্রির আকাঙ্ক্ষাও করে যুদ্ধের কৌশল ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায়। তার গোলায় আটশ মণ চাল, তার ধর্মের আবরণ অথচ মানুষ মারা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষে — 'তিরিশ টাকা চালের বাজারে কে ভিক্ষে দেবে এখন?' মানুষকে ভিক্ষুকে পরিণত করার অর্থনৈতিক বৈষম্যের বাস্তবতা রক্ষিত হয় নিশিকান্ত ও ইব্রাহিম দারোগা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র-সমাজব্যবস্থায়। ভিক্ষুকে পরিণত করা, তবু ভিক্ষার

পথও বন্ধ; চৌকিদার জানায়, 'যে আগুন চারদিকে জ্বলছে, কারো রেহাই পাবার জো আছে!' মৃত্যু অনিবার্য যেন এবং মুত্যু নিয়ে শাসকবর্গের ক্রূর ভাবনা :

> যারা মরছে, মরুক তারা। কাল পূর্ণ হলে মানুষকে মরতেই হবে, কেউ তো আর লোহা দিয়ে মাথা বাধিয়ে আসে না। না খেয়ে মরেছে, সে তো কৃতকর্মের ফল। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির দেনা এ জন্মে শোধ করতেই হবে— হুঁ হুঁ, বিধাতার রাজ্যে অবিচার হওয়ার জো নেই। [*গল্পসমগ্র*, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ২১৫]

বিত্ত ও দুর্বৃত্তকে আবৃত করে রাখে যে ধর্ম তার প্রতিও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তামাশাপ্রবণ। ধর্ম শাসক-শোষকের ব্যবহৃত ঢাল — এই সত্যেই মতি ও তার স্ত্রীর দুর্ভিক্ষে আত্মহত্যা পূর্ব-কর্মফল, এই মৃত্যুর সঙ্গে নিশিকান্তের যোগসূত্র নেই! তবু গল্পকারের প্রশ্ন : 'এই মুত্য — এই অপঘাত, এদের জন্য দায়ী কে? দৈব?' নিশ্চিতভাবে গল্পকারের অঙ্গুলি নির্দেশ সামাজিক আবহের প্রতি — ধর্মসভা, দারোগা-বিশাখা অভিসার এবং নিশিকান্তের সৃষ্ট 'যুদ্ধের দিনকাল-মন্বন্তর যাকে বলে।' মানুষের অর্থলোভ সৃষ্টি করছে মৃত্যু, কেননা নিশিকান্তও চল্লিশ টাকা মণ দরে চালটা বিক্রি করতে পারলে 'রক্তের মতো টকটকে লাল হয়ে যাবে।' বর্ষার জলে ভিজে চাল নষ্ট হওয়া, তার দুর্গন্ধ এবং নিশিকান্তের অনিঃশেষ লোভের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীকী চিত্রকল্পে গল্পের পরিণাম নির্দেশিত :

> হঠাৎ নিশির মনে হল, কেন কে জানে, অত্যন্ত অপ্রসঙ্গিকভাবে মনে হল: ঠিক এই রকম একটা পচা গন্ধই সে পেয়েছিল আর একবার। শিবপুরের হাট থেকে সে ফিরছিল। চোখে পড়েছিল—মাঠের মাঝখানে একটা গলিত গোরুর দেহ আগলে বসে আছে একটা ঘেয়ো কুকুর; চারিদিক থেকে শকুনেরা উড়ে উড়ে সেই মড়াটাকে ঠোকর মারবার চেষ্টা করছে, আর কুকুরটা অস্বাভাবিক প্রচণ্ড চিৎকার করে ক্ষুধার্ত শকুনগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। (গল্প সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৭]

দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে মজুতদারের মানবিক অপচয় ও লোভের খতিয়ান মাত্র নয় গল্পটি, শৈল্পিক অনির্দেশ্যতায় তার সর্বপ্রসারী অবমুক্তি ঘটেছে। মানুষের ভোগ্যবস্তুর অপচয়, অবৈধ সংগ্রহ ও অনিবার্য মৃত্যুর বাস্তবতায় নিশিকান্ত তাই পরিণত হয়েছে ক্ষুধার্ত শকুনে, অপর দিকে তারই লীলাসঙ্গিনী বিশাখাকে ব্যবহার করে যায় ইব্রাহিম দারোগা।

২.

যুদ্ধ সৃষ্টি করে বহুমাত্রিক সংকট। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর পরিপূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে অস্তিত্বের প্রধানতম শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বিশেষত উপনিবেশগুলোতে উপনিবেশকের দায়হীনতা সৃষ্টি করে নৈরাজ্যিক পরিত্যক্ত পরিস্থিতি এবং এর মাধ্যমে জেগে ওঠে সুযোগসন্ধানী শোষকের দল—উপনিবেশকেরই সগোত্র। খাদ্য ও বস্ত্র সংকটের মাধ্যমে বাণিজ্যের যে অপকৌশল ও মানবীয় সংকট সৃষ্ট হয়েছে তারই প্রতীক উপস্থাপন 'দুঃশাসন'[৬] গল্পটি। সমকালীন কৃত্রিম বস্ত্র সংকটের সঙ্গে দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পটির প্রত্নপ্রতিম আত্মাকে সচল রেখেছেন। 'ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দরে বড় ব্যবসায়ী দেবীদাস' এবং তার ব্যবসাক্ষেত্রে বসে আছে একটি লোক 'তীর্থের কাকের মতো', প্রয়োজন একখণ্ড বস্ত্র যাতে 'মান ইজ্জত থাকে'। মানুষের তীর্থ এখন দেবীদাসের ব্যবসায়-ক্ষেত্র, বস্ত্রালয় — কেননা এরই সহায়তায় মানবধর্ম রক্ষা পায়। কিন্তু দেবীদাস ভিন্নপথের দার্শনিক, তার দৃষ্টিতে পড়ে 'নগ্ন অনাবৃত পৃথিবী' — সূর্যদেবও ধরা পড়েছেন অবাধ পুঁজি ও বাণিজ্যের আলোয়। তবু বনঝাউয়ের হাওয়া-লাগা দোদুল্যমানতা যেন প্রাকৃতিক 'দীর্ঘশ্বাস'। নগ্ন পৃথিবীর রূপকার্থে নগ্ন মানুষ বস্ত্রের অভাবে, তাতোধিক নগ্ন শোষণের কৌশল ও মুনাফাখোরের লোভ। সে জন্যই লোকটি বস্ত্র পায়নি, কেননা 'ওকে একখানা দিলে দু'ঘণ্টার মধ্যেই দোরগোড়ায় উল্টো চণ্ডীর মেলা বসে যেতো'; ফলে ভগবানই মুনাফাখোরের আশ্রয় : 'কী করবি বল্— সবই ভগবানের মার। কেন যে এই যুদ্ধ বাধল আর আকাল দেখা দিল এক ভগবানই বলতে পারেন সে কথা।' অধিক মুনাফার জন্য বস্ত্র মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে যে নগ্ন বাস্তবতা সৃষ্ট হলো তার অন্যতম কারিগর দেবীদাস, তবু তারই দৃষ্টিতে শ্মশান-সদৃশ পৃথিবী— আত্মসমীক্ষার ইঙ্গিত :

> দেবীদাস খোলা জানালার পথে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। রিক্তশ্রী পাণ্ডুর পৃথিবী, বৈশাখের রোদ যেন শ্যামলতার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে নিয়ে গেছে। জ্বলন্ত আকাশটার তলা দিয়ে উড়ে চলেছে 'সামকল' পাখির ঝাঁক— পিপাসায় কাতর হয়ে কোনো সুদূর বিল কিংবা জলার সন্ধানেই চলেছে হয়তো। মেটে পথটার ওপর হাওয়ায় ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে— শাঁ শাঁ করে শব্দ করছে বনঝাউয়ের দল। কোনোখানে একটি মানুষ নেই— যেন শ্মশান – [*গল্পসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৬]

দেবীদাস মজুতদার, মুনাফাখোর, শোষক এবং প্রকাশ্যে মানবিক, তবু তার অবসাদ আক্রান্ত মনোভাব স্পষ্ট। সে যেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা — শোষক তার ভবিষ্যৎ অনুভব করতে পারলেও বাস্তবতার অন্তর্টানে পথবিচ্যুত হয় না। এ জন্যই অবৈধ ব্যবসায়ে কয়েকটি মামলা হওয়ার পর থানার কনস্টেবল কানাই দে-কে সম্মান না করে পারা যায় না এবং থানায় যাত্রাপালার পঞ্চাশ টাকা চাঁদাও সে আদায় করে নেয়। অবৈধ ব্যবসায় ও রাষ্ট্রের, বিশেষত পুলিশ প্রশাসনের যোগসূত্রে সামগ্রিক অনৈতিক আর্থসামাজিক কাঠামোটি সুচিহ্নিত হয়। দেবীদাস শোষণযন্ত্রের অনিবার্য অংশ হয়েও শোষণ কৌশলের ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়; তার মনে হয় 'রিক্ত মৃত্যুপাণ্ডুর বাংলাদেশে'র পরিপ্রেক্ষিতে থানার লাল বাড়িটা 'নিষ্প্রাণ মাটির ফাটা বুকের ভেতর থেকে তার হৃৎপিণ্ডের মতো যেন বেরিয়ে এসেছে একটা রক্তজবা' — রক্তরঞ্জিত। অপর দিকে দেবীদাসের সাদা বাড়িটা তারই ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরদাসের দৃষ্টিতে 'মানুষের হাড়ে' তৈরি, যদিও তা অব্যক্ত থেকে যায়। মানুষের হাড়, আর রক্তমাংসে পুষ্ট হচ্ছে সমকালীন অপর মানুষ, অর্থাৎ শাসকের স্থাবর-অস্থাবর সহায়-সম্পদ।

খাদ্যাভাব, বস্ত্রসংকট ও যুদ্ধকালীন মৃত্যুভীতির প্রেক্ষাপটে থানার দারোগা শচীকান্তের আলোকোৎসব ও যাত্রাপালার আয়োজন ক্রূর অমানবিক রাষ্ট্রনৈতিক তামাশা মাত্র। এজন্যই 'মন্ত্রবলে সমস্ত জগৎটা যেন আদিম একাত্মতায় ফিরে গেছে'— 'মানুষ, শেয়াল আর সরীসৃপে'র সম্মিলন। একদিকে অভুক্ত মানুষ, অপর দিকে যাত্রাপালা, এরই মাঝে শেয়ারে নেওয়া সন্তানের জন্য মায়ের আর্তচিৎকার আর্থসামাজিক প্রতিরূপকতা। 'অর্ধনগ্ন অর্ধভুক্ত' দর্শকের বিপরীতে উদ্যোক্তার 'যুদ্ধের বাজারে অমন চমৎকার আদ্দি' বিস্ময় মাত্র নয়, বৈষম্যের অমানবিকতায় অন্তর্শ্লেষযুক্ত। দেবীদাস জানে ঘুষের টাকায়—যার মাধ্যমে মুনাফাখোর মামলার জাল কেটে বেরিয়ে যায়— দারোগা ফুলে-ফেঁপে উঠছে। শ্রেণীবৈষম্য ও সামাজিক বর্গবিন্যাসের অনুকূলে আসন ব্যবস্থাপনায় শুরু হয় যাত্রাপালা :

> সমস্ত পৃথিবীটা বদলে গেছে মুহূর্তেই। আলো আর গানে বাংলাদেশের ছোট এই গ্রামটা হাজার হাজার আগেকার কুরুক্ষেত্রে ফিরে চলে গেছে।....
>
> ইতিহাস চলেছে বজ্রগতিতে ঝড়ের আবেগে! রক্ততরঙ্গিত কুরুক্ষেত্র। একটির পর একটি মহারথী বীরশয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছে। শকুনির হাতের পাশা আজ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজমুকুট নিয়ে জুয়া খেলছে। আত্মগ্লানিতে পীড়িত হয়ে দুর্যোধন বলছেন : মাতুল, তোমার জন্যেই আজ আমার এই সর্বনাশ হল!....

> ওদিকে দ্রৌপদীর চোখে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে আগুন। অযত্নবিন্যস্ত রুক্ষ চুল তাঁর সর্বাঙ্গে যেন প্রলয়ের মেঘের মতো ভেঙে পড়েছে। সেই দীপ্ত নারীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দিগ্বিজয়ী অর্জুন পর্যন্ত মাথা নিচু করে আছেন।
>
> — শোন কেশব, শোন ভীমসেন— শোন ধনঞ্জয়। প্রকাশ্যে রাজসভায় সেই মর্মান্তিক অপমানের পরে শুধু তোমাদের মুখ চেয়েই পাঞ্চালী আত্মহত্যা করেনি। কিন্তু আর নয়। দুঃশাসনের রক্তরঞ্জিত হাতে যদি বেণী-বেণীবন্ধন না করতে পারি, তাহলে জেনে রেখো, সতীর অভিশাপে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে যাবে।......
>
> অদ্ভুত জমেছে গান। দেবীদাস ভুলে গেছে নিজেকে— এমনকি পঞ্চাশ টাকার ক্ষতিটাও এখন আর তত তীব্র বলে মনে হচ্ছে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফিরে এসেছে বাংলাদেশে। গৌরদাসের মনে হতে লাগল— সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে। কিন্তু তার অভিশাপে কি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ভস্ম হয়ে যেতে পারে? কে বলবে! [*গল্পসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩০]

মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের বিরোধকে সমকালীন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সমধর্মিতায় উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজনৈতিক কূটকৌশলে পরাজিত ও দ্রৌপদীর অপমান নিয়ে পাণ্ডবদের জ্বলে উঠবার আকাঙ্ক্ষা বর্তমানেও বাঞ্ছিত। শকুনির পাশা খেলার রাজনীতিতে বিপন্ন মানবাত্মা দ্রৌপদী, যেমন বর্তমানে যুদ্ধের অনিবার্যতায় অসহায় লক্ষ মানুষ নিরন্ন ও বস্ত্রহীন। দ্রৌপদীর মতোই দুঃশাসনরূপী শোষকের হাতে সম্ভ্রমহানি ঘটছে লক্ষ নারী-পুরুষের। দ্রৌপদী যেমন প্রতিশোধের আহ্বান জানিয়েছেন, তেমনি লেখকও সামগ্রিক অবমাননার প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা করেন। দেবীদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরদাসের মনোভাবে স্পষ্ট হয় আবিশ্ব দ্রৌপদীর অভিশাপ, আর্তনাদ ও তার প্রতিকারস্পৃহা। মহাভারতে ভীমের গদার আঘাতে দুঃশাসন ধরাশায়ী এবং এর মাধ্যমে রক্তাক্ত মানবীয় দায় নিষ্পন্ন হলেও বর্তমান অসহায়তায় মানুষ জেগে উঠেনি। এখনো শোনা যায় পুত্রহারা মায়ের ক্রন্দন এবং দ্রৌপদীর উপস্থিতি মহাভারতে নয়, এই বাংলায়—

> ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর একসঙ্গেই চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌরদাসের দৃষ্টি— ছল ছল করে উঠল

> রক্ত। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে এক ফালি কাপড় নেই— কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে। [*গল্পসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩২]

দেবীদাস ও গৌরদাস মহাভারতের নাট্যরূপ মঞ্চে উপভোগ করেছে এবং ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের ধ্বংসে তাদের ধর্মীয় আত্মা স্বস্তি বোধ করেছে। কিন্তু বর্তমান যুগের বস্ত্রহরণকারীদের অন্যতম দেবীদাস ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র আতঙ্কিত; কেননা তাদেরও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যে বাণিজ্যের দুঃশাসনে নারীর বস্ত্রহরণ ঘটলো তার ধর্মীয় নিষ্পত্তি অসম্ভব, প্রয়োজন নির্যাতিত মানুষের প্রতিরোধ এবং প্রতিশোধ স্পৃহা। লেখক সমকালীন সংঘবদ্ধতার ইঙ্গিতে গল্পটির পরিণাম নির্দেশ করেছেন, যা রক্তাক্ত বিপ্লবের সুনির্দিষ্টতায় তাৎপর্যময়। ফসলহীন রিক্ত মাঠের ভাঙা আলে বসা একদল মানুষের ধারালো হেঁসো এবং তাতে বিচ্ছুরিত সূর্যের আলো আগামী উজ্জ্বল দিনের সংঘাতময়তার সংকেত; কেননা শোষক-সহায়ক গৌরদাসই হেঁসোতে শান দেওয়া নিয়ে ভীত, তার চোখেই ধরা পড়ে নতুনতর এক কুরুক্ষেত্র।

৩.

মৃত্যুময় পৃথিবীতে জেগে থাকে অনির্বাণ প্রাণের শিখা —এই বোধ নিয়ে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম গল্প 'পুষ্করা'।[৭] মন্বন্তর ও মৃত্যু সমার্থক এবং এজন্যই গল্পের প্রারম্ভিক পটভূমি শ্মশান — শ্মশান যেন জীবন-বাস্তবতার প্রতিরূপক। বিশ্বব্যাপী হিংসা, শোষণ, আগ্রাসন আর মানবিক অপচয়ের ক্রুর পরিণামের ইতিকথা লিখিত হয় শ্মশানের জ্বলন্ত আগুনে। মানবসৃষ্ট মন্বন্তরে মৃত্যু অনিবার্য — মৃত্যু খেতে না পেয়ে, মৃত্যু মহামারীতে— ফলে শ্মশানই সত্য। কলেরায় উজাড় হওয়া গ্রামের ভীতিতাড়িত মানুষ তাই নিয়তিনিবিষ্ট, অসহায়; তাদের রাষ্ট্রের আশ্রয় নেই, আছে সর্বশেষ কালীপূজোয় বিশ্বাস। তাদের 'শুক্লা চতুর্দশীর' আশ্বিনের রাত কালো মেঘে ঢেকে যায়; সন্ধ্যায় যে নদীর জল রূপো গলানো জীবনময় ছিল তা-ই 'কালো আর পিঙ্গলে মিশে হিংস্রতার রূপ' নেয়, 'বনজঙ্গলগুলো রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন আর আকারহীন বিভীষিকা' নিয়ে সৃষ্টি করে প্রতীকী পরিবেশ। হিংস্র পরিবেশ, হিংস্র দেবী কালী ও হিংস্র মহামারী — তবু অশাস্ত্রীয় কালীপূজো কেবল মুক্তির প্রত্যাশায়। কালীপূজোয় শিবাভোগ নিয়ে স্বনামধন্য তর্করত্নের বিনিদ্র অপেক্ষা, যদি শেয়াল এসে আহার করে তবেই মহামারী থেকে রক্ষা; অন্যথায় 'পুষ্করা পাবে। কারো রক্ষা থাকবে না।' পূজোর মধ্যস্থতায় মহামারি থেকে মানুষের মুক্তি একদিকে, অন্যদিকে তর্করত্নের

আত্মসম্মান। তিনশো টাকা দক্ষিণার লোভে সে শাহরিক লক্ষ্মীপূজো ছেড়ে গ্রামীণ কালীপূজোয় আগ্রহী হয়েছে, যদি এতে সিদ্ধি না আসে সম্মান ও অর্থ দুই-ই ধূলিস্মাৎ হবে। তবু শাহরিক লক্ষ্মীদেবী ও গ্রামীণ কালীদেবী কেবল বৈপরীত্যময় উপস্থাপন নয়, আর্থসামাজিক বৈষম্যেরও ইঙ্গিত। ঔপনিবেশিক কৌশলে সংগৃহীত বিত্ত শহরে স্তূপিকৃত হলেও গ্রামীণ জীবন খাদ্যাভাবে মহামারী আক্রান্ত। অপর দিকে শক্তিসাধনার এ প্রবণতা অধিকার প্রমত্ত মানুষের নয়, অসহায়ের আশ্রয় সন্ধান। মধ্যস্বত্বভোগী তর্করত্ন ও প্রতিমা নির্মাতা সর্বহারা কাশী কুমোরের কথোপকথনে সৃষ্ট হয় শ্লেষ :

> ঝিমুতে ঝিমুতে কাশী কুমোর হঠাৎ যেন চমকে উঠল।
>
> – কী ঠাকুর, কী খবর?
>
> – খবর আবার কী? যা কপালে আছে, তাই হবে। — কথার শেষ দিকটা কান্নায় কাঁপতে লাগল।
>
> – শেয়াল এল না?
>
> – না। তর্করত্নের চোখে এবার অশ্রু ছলছল করে উঠল।
>
> – ও আর এসেছে। কত মড়া পাচ্ছে খেতে, খিদে তেষ্টা তো নেই। আর তাজা মানুষের রক্তেই দেবীর পেট ভরছে। তোমার ওই শুকনো চিম্‌সে লুচি আর পোয়াটাক্ বোকা পাঁঠার মাংস খেতে তো বয়েই গেছে তাদের।
>
> – তুই থাম হারামজাদা — বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন তর্করত্ন; যা বুঝিসনে, তার ওপর কেন কথা কইতে যাস।
>
> – হে-হে-হে — নির্বোধ শব্দ করে কাশীকুমোর হেসে উঠল। গাজার নেশায় তার ভয়ডর ভেঙে গেছে।— আচ্ছা, আমি থামলাম। ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয়। আমার তো সবই ওলা-দেবীর পেটে গেছে। বউ ব্যাটা সমস্তই। পরা লাগুক আর গোড়ার ডিমই লাগুক— ওতে আমার আর কী হবে ঠাকুর।

শাহরিক লক্ষ্মীর পূজক তর্করত্ন গ্রামীণ হিংস্রদেবী কালির সম্মুখে অসহায়। দুর্ভিক্ষ ও মানব-অস্তিত্বের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে কাশীকুমোর। বিশ্বাসের পৃথিবী থেকে মৃত্যুর আঘাতে সে বস্তুর শ্লেষ বিস্তার করে যায়; কেবল গাজার নেশায় দেবী আর শেয়াল ও বাটপাড় সমীকৃত হয়ে যায়? ধর্মের প্রথাগত কাঠামো মাত্র নয়, অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমিকেও সে আঘাত করেনি? সহায়শূন্য কাশী

যেমন বাস্তব, তেমনি বাস্তব সামাজিক বাটপাড়ের উপস্থিতি। এই সূত্রেই তর্করত্নের বিনিদ্র অপেক্ষা সফল হয়, দেবী সশরীরে শিবাভোগ গ্রহণ করেন। 'বিস্ফারিত চোখ মেলে তর্করত্ন দেখতে লাগলেন কী ক্ষুধার্তভাবে চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি নিশাচরের মতো তীক্ষ্নতা পেয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একমাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে।' বিশ্বাসের আধিভৌতিক পরিস্থিতিতে মারীভীত মানুষ, তর্করত্ন ও কাশীকুমোর জেগে ওঠে জীবনের কূটাভাস নিয়ে। কলিযুগেও সশরীরে দেবীর আবির্ভাব, বিশ্বাসীর আবেগ যুক্তির সকল সীমা ভেঙে প্রবাহিত হয় এবং তর্করত্নের বিদায়কালে 'গাড়ির অর্ধেকটা দানে দক্ষিণায় বোঝাই।' লাভের হিসাব তিনশ থেকে পাঁচশো-তে উন্নীত হয় এবং একে তর্করত্ন যুদ্ধের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব বিকাশ-চিহ্ন হিসেবে ভাবতে পারে! মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও ব্যবসার হিসাব নেওয়াটা ধনতান্ত্রিক সমাজ কৌশল – ধর্ম বিশ্বাসও তার বাইরে নয় এবং অধিক প্রাপ্তিতে তর্করত্নের উল্লাস। তবু তর্করত্নের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে আর্থসামাজিক বৈপরত্যি ঃ 'এখানে ওখানে গ্রাম; এত শস্য— এত জীবনের মধ্যেও মৃত্যু আর মন্বন্তরের স্পর্শে নিস্তব্ধ।' কেবল উৎপাদন নয়, বণ্টনের অসাম্যেই মানুষ অসহায় — মৃত্যুর অনিবার্যতা। মহামারী তাই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না, আর্থ-সামাজিক বৈষম্যে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ খুঁজে। যথেষ্ট সম্পদ কিংবা ফসল সামাজিকভাবে উৎপাদিত হলেও বাণিজ্যের কৌশলে তা নিরন্নের হস্তগত হয় না—পণ্যের বিমানবিক সত্যে মানুষও ভোক্তামূল্যে বিবেচিত এবং ক্রয়ক্ষমতার অভাবে দেখা দেয় মন্বন্তর, অনিবার্য মৃত্যু। তর্করত্ন জেনে যায়নি ডোমপাড়ার পাগলিটা— যার 'তিনটে বেটা আর সোয়ামী না খেয়ে মরে গেছে' অকালে— তারই দেখা রাত্রিকালীন দেবী কালী এখন কাতরাচ্ছে রাস্তায় পড়ে। তবু সাঁওতাল পাড়ায় কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপূজা — ধানক্ষেতে জ্বলছে প্রদীপের শিখা; এই হচ্ছে মৃত্যু ও জীবনের সমান্তরাল প্রবহমানতা। জীবনের প্রতিই মানুষের সহজাত আকর্ষণ :

> তর্করত্নের মনটা হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠল। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দোহাই শ্মশানকালী, কৃপা করো মা। পুষ্করা কেটে যাক, মানুষ আবার বেঁচে উঠুক। মা মহাকালী, তুমি মহালক্ষ্মী হয়ে এসে দেখা দাও।
>
> এত ধান, এত ফসল, পুষ্করা কেটে যাবে বইকি। কিন্তু একটা জিনিস তর্করত্ন বুঝতে পারেননি। তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ওই ডোমপাড়ার

পাগলিটার রূপ ধরেই— আর এখনো পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে— কালীর মতো জিভ মেলে হাঁপাচ্ছে এক ফোঁটা জলের জন্যে। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারেনি।

কিন্তু তবুও পুষ্করা কেটে যাবে। মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়। [*গল্পসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪৮]

মন্বন্তরের মৃত্যুভীতি ও শ্মশানের পরিপ্রেক্ষিতে অনিঃশেষ জীবনাকাঙ্ক্ষায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দার্শনিক অধিষ্ঠান। অশুভ মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দেবে পূর্ণিমার চাঁদ — সৃষ্টিশীল জাগরণ, এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি উজ্জীবন আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রকৃতির ধর্মেই জীবন বিজয়ী হবে, তবু শ্মশানচারী শিব আবির্ভূত হয় নীলকণ্ঠ হিসেবে — এই নীলকণ্ঠ সাধারণ জনতা।

৪.

'নক্র-চরিত', 'দুঃশাসন' ও 'পুষ্করা' ব্যতীত যুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'কবর' 'তীর্থযাত্রা', 'লুচির উপাখ্যান', 'কালোজল', 'খড়গ', 'ডিম', 'ভাঙা চশমা', 'হাড়' প্রভৃতি গল্প। সমকালে অন্যান্য গল্পকারসহ[৮] যুদ্ধ ও মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পভূবন ইতিহাস এবং বাস্তববাদের যুগলবন্দি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উপনিবেশিত ভারতবর্ষ তথা বাংলা-অঞ্চলের জন্য রাজনৈতিক উচ্চাশা ও যুদ্ধমুক্ত অঞ্চলের সুবিধায় অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগ বয়ে এনেছিল এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছিল আধুনিকতাবাদ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষ সক্রিয়ভাবে আবির্ভূত হতে বাধ্য হয়েছে। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সমকালীন আর্থরাজনীতিক দ্বৈততা ও শোষণের কৌশল দায়ী,[৯] তেমনিভাবে ১৩৫০-এর মন্বন্তরের জন্যও দায়ী যুদ্ধ ও বাণিজ্যের মানবসৃষ্ট কৃত্রিম সংকট।[১০] খরা-বন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত সৈনিকদের ভারতবর্ষে আগমন ও তাদের খাদ্যচাহিদা, যুদ্ধভীতি ও শরণার্থীর আগমন, আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্যহীনতা, পরিবহন ব্যবস্থায় ভাঙন, মুনাফালোভী ব্যবসায় মজুত-কালোবাজার, অদূরদর্শী প্রশাসনিক কাঠামো ও বণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্য মন্বন্তরের জন্য অন্যতম কয়েকটি কারণ। সমগ্র ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত সুযোগ সন্ধানী মানুষ, যাদের কারণে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রয়মূল্য সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে

যায়। এর ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় আর্থসামাজিক নৈরাজ্য—আকস্মিক উত্থান-পতন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মৃত্যু। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই সামগ্রিক মানবিক অপচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর গল্পগুলোকে বিন্যাস করেছেন। তিনি গল্পে অনৈতিক ব্যবসায়, ব্যবসায়-মজুত-কালোবাজার ও প্রশাসনের যোগসূত্রের স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন এবং তা ইতিহাস সমর্থিত : 'বাজারের সবচেয়ে বড় ক্রেতা সরকার, সবচেয়ে বড় মজুতদারও সরকার এবং সরকারের সাহায্যকারী কলকারখানার মালিকও ধনিক সম্প্রদায়।'[১১] 'নক্র-চরিত' গল্পে নিশিকান্তের মজুতদারি, অধিক মুনাফার লোভে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট চাল বিক্রয় ও পুলিশকে ঘুষ প্রদান সমগ্র চক্রটিকে নির্দেশ করে। যুদ্ধের সূচনায় সরকার সর্বোচ্চ শতকরা বিশভাগ মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয় ব্যবসায়ীদের, যা শেষ পর্যন্ত লাগামহীন হয়ে পড়ে[১২] এবং ব্যবসায়ীদের মজুত ও কালোবাজারের প্রতি উৎসাহী করে তোলে। 'দুঃশাসন' গল্পে যে বস্ত্র সংকট তা মূল্যবৃদ্ধিজনিত এবং কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৪ সালের ১০ই মার্চ 'বস্ত্র সংকট দিন' হিসেবে পালিত হয়। মৃত্যুময় পরিস্থিতিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্ধকার ও শ্বাপদ শঙ্কুল ভীতিকর প্রতিরূপকী পরিবেশে তাঁর গল্পের ঘটনাসংস্থান ঘটিয়েছেন। নিশিকান্ত অন্ধকার জগতের ব্যবসায়ী, আর দেবীদাস ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্শ্লেষ এবং তর্করত্ন আত্মতর্কে স্বপ্নদ্রষ্টা। উপনিবেশিত রাষ্ট্রকাঠামো, বাণিজ্যপুঁজির অনৈতিকতা ও মধ্যস্বত্বভোগী ধর্মচরিত্রের দুর্বিপাকের পরও মানুষ উজ্জীবনের স্বপ্ন দেখে; শোষক পরিণত হয় শবভুক শকুনে, ভীতিগ্রস্ত; হেঁসোকে শাণিত করে প্রতিরোধস্পৃহ প্রতীকী মানুষ; মেঘের আড়াল আর অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে আসে পূর্ণিমার চাঁদ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাস্তবতার তন্নিষ্ঠ রূপকার; সম্ভাবনার শিল্পী।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. দ্রষ্টব্য : 'নিজের দিকে ফিরে', তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বর্মণ সম্পাদিত 'কোরক', বইমেলা ১৩৯৮, কলকাতা, পৃ. ২২-২৩।

২. দ্র. বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ,* এস. পি. পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯, পৃ. ২৩১-২৩২

৩. সুচিত্রা সেন চন্দ্র, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সময়ের দর্পণ', সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', বর্ষ ২৭ মাঘ-চৈত্র ১৩৯৮ সংখ্যা-৪, কলকাতা, পৃ. ৪৪২।

৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'দেশ', ২০শে পৌষ ১৯৬৯, পৃ. ৮৯৫। প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'কোরক', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৫. 'নক্র-চরিত' গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাঙাবন্দর' (১৩৫২) সংকলনভুক্ত। বর্তমান আলোচনায় গল্প-পাঠ গৃহীত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *গল্পসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড) থেকে। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪০৬।

৬. 'দুঃশাসন' গল্পটি *দুঃশাসন* (১৯৫২, গ্রন্থভুক্ত। বর্তমান আলোচনার গল্প-পাঠ গৃহীত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *গল্পসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড) থেকে।

৭. 'পুষ্করা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'দেশ', ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ সংখ্যায়। গল্পটি *দুঃশাসন* গ্রন্থভুক্ত। বর্তমান পাঠ গৃহীত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *গল্পসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড) থেকে।

৮. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিশ শতকের চতুর্থদশকের শেষার্ধে আবির্ভূত গল্পকার। তাঁর পূর্বজ ও সমসাময়িক অনেকেই তখন গল্প রচনায় সক্রিয়। তাঁরা মন্বন্তরকে অবলম্বন করে সামগ্রিক আর্থসামাজিক বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) 'ভীড়', 'পার্থক্য', 'চাউল', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) – 'পৌষলক্ষ্মী' 'বোবাকান্না', 'তিনশূন্য'; পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭১) – 'ভাঙন', 'কৃষ্ণহরির চাল', 'শেষের হিসাব', 'পরিচয়'; মনোজবসু (১৯০১-১৯৮৭) – 'দ্বীপের মানুষ', 'বন্যা', 'কনেট্রালের লাইন', 'মানুষ ও গরু'; সরোজকুমার রায় চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২) – 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী', 'আগুন', 'ছন্নছাড়া', 'ক্ষুধা'; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) – 'কেরোসিন', 'হাড়', 'বস্ত্র', 'কাক'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) – 'প্রাণের গুদাম', 'নমুনা', 'তারপরঃ', 'নেড়ি', 'অমানুষিক', 'প্রাণ', 'দুঃশাসনীয়'; গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৫) 'ম্যায় ভুখা হুঁ', 'মহাকালের নিশ্বাস'; নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) – 'আবরণ', 'রসাভাস', 'রূপান্তর', 'পুনশ্চ' 'মদনভস্ম' প্রভৃতি গল্প সমকালে লিখিত হয়েছে।

৯. দ্র. নিখিল সুর, *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮১।

১০. দ্র. ক. ডঃ ভাস্বতী লাহিড়ী, *সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প (১৯৪০-৫০),* শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, পৃ. ১৪-১৭।

খ. ড. বিনতা রায় চৌধুরী, *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৯-২১।

গ. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ২৭৮—২৮০।

১১. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তর,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫১, পৃ. ৬।

১২. দ্র. Michael Brown, *India Need Not Starve!* Long mans, Green and Co. Ltd. Madras, 1944, P. 35—36.